উৎসর্গ

সাগর কান্তি দেব'কে

ভূমিকা

তখনও অতিমারি শুরু হয়নি। বসে আছি একটা পারকিং লটে। গাড়ির রেডিও অন করে রেডিও-শো শুনছি। যিনি বলছেন-তিনি একজন জীবাণুবিদ। সঞ্চালককে বেশ অবাক করে দিয়ে তিনি বেশ সরাসরি বললেন, 'ধরে নিন, আগামী দু বছরে আপনার খুব কাছের কেও না কেও মারা যাবে। প্রস্তুত হন। আমি তামাশা করে এ কথা বলছি না।'

সঞ্চালক তাতে চমকে উঠেছিলেন কি-না জানি না। আমি উঠেছিলাম। বুকের ভেতরটায় অজানা শঙ্কার দামামা বেজেছিল। তার মাত্র মাস খানেকের মাঝেই গোটা পৃথিবী যেন স্তব্ধ। বাড়ির থেকে বহু দূরের স্থানে যাওয়া তো কল্পনাসম ব্যাপার; খুব নিকটের পার্কটিও বন্ধ করে নগর কর্তৃপক্ষ টানিয়ে দিল হুঁশিয়ারি বাণী লেখা নোটিশ। জীবন তখন কেবল চার দেয়ালে বন্দি। এমন একটা পরিস্থিতি দীর্ঘকাল সইবার মত করে মানসিক শক্তি অর্জন করা কঠিন। বিশেষ করে আমার মত ভবঘুরে ঘরানার মানুষের। আমার মন তখন কেবলই দিন গোনে, কবে পৃথিবী আবারও ফিরে যাবে সেই পুরনো ঠিকানায়।

অবশেষে সেই দিন এল পরের বছরের মাঝামাঝি সময়ে। গ্রিক দেশ দুয়ার খুলে দিল। কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যদিও। সেই সংবাদ কাগজে পড়ামাত্র আমি বিমানের টিকেট কিনে ফেললাম। গন্তব্য-গ্রিক দেশের পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপ করফু।

বিমান করফু'র মাটি স্পর্শ করার আগেই চোখে পড়ে নীলকান্তমণি রঙের সাগরজল, উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় আকাশ, হরিণের শিঙের মতো করেই কিছুটা বেঁকে থাকা পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে জলপাই-এর বন আর মৎস্যশিকারি অলস কিছু জেলের স্থবির প্রতিবিম্ব। মুহূর্তেই যেন এ দৃশ্য মনোজগতকে কব্জা করে ফেলে। আমি এ দ্বীপেই কাটিয়ে দিই বেশ ক'টা দিন। ভুলে যাই করোনাজনিত উদ্বেগের কথা। সাগরের ধারটায় হাঁটি; জেলেদের মাছ ধরা, সাঁতার কাটা দেখি। ছোট কোন মুদি দোকান থেকে জলপাই এর চকলেট কিনে খাই; আর সেই সাথে গলায় ঢালি গ্রিক দেশের ফল কুমকোয়াট থেকে উৎপাদিত পানীয়। একসময় আমার মনে হয়-বাকি জীবনটা এই মন্থর দ্বীপে কাটিয়ে দিলেও হয়তো মন্দ হয় না।

যদিও বাস্তবতার স্রোত আবার নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চিরাচরিত জীবনে। আমি আবারও পালাবার পথ খুঁজি।

এবারে এসে উপস্থিত হই ছবির দেশ, কবিতার দেশ ফ্রান্সে। মূলত প্যারিসনিবাসী সাগর কান্তি দেব-এর আমন্ত্রণে।

প্যারিস থেকে ট্রেনে করে আমি চলে যাই দূর দখিনের আলো হাওয়াময় অঞ্চল কোঁত দাঁজয়া'তে। এ অঞ্চলেই এক সময়ে রাতের হলদে তারা দেখবেন বলে ঝোলা কাঁধে উপস্থিত হয়েছিলেন ভ্যান গগ, পাহাড়ের গায়ে উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছের জ্যামিতিক জজ্ঞা আঁকবেন বলে এসেছিলেন পল সেজান। আমরা তাঁদের আঁকাআঁকির স্থানগুলো খুঁজে বার করি। প্যারিসে ফিরে আসার পরও ছবির নেশা আমাদের কাটে না। আমরা তখন ছুটে যাই প্যারিস থেকে কিছুটা দূরের এক নিভৃত গাঁয়ে। জীবনের শেষ দুটি দশকে যেখানে ক্লদ মনে এঁকে গেছেন তাঁর বাড়ির আঙিনার পদ্ম পুকুর-ভিন্ন ঋতুতে, ভিন্ন আলোয় স্নান করে।

এইসব গল্পগুলোই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি পাঠকের সাথে। গত প্রায় তিন বছরে লেখা এ গল্পগুলোর অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক কালবেলা, দৈনিক সমকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো-সহ বেশ কিছু পত্রিকায়। পত্রিকাগুলোর সাহিত্যপাতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি তাই সবিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নটিলাস প্রকাশনীর কর্ণধার আশিক সারওয়ারকেও ধন্যবাদ আমাকে নিয়মিত তাগাদা দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করাবার জন্যে। আর হ্যাঁ, শিল্পী সব্যসাচী মিস্ত্রী যে বইমেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে এ বইয়ের প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়েছেন, সেজন্যে তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

সঞ্জয় দে
সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া
জানুয়ারি ২২, ২০২৪

পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা প্রশস্ত ধাপের সিঁড়ি। শ্বেত পাথরের। শতাব্দীর প্রবঞ্চনায় এখন আর ওগুলো শ্বেত নেই অবশ্য। ধূসর। দুপাশ থেকে বৃক্ষমঞ্জরির শাখা নেমে এসে জাপটে ধরতে চেয়েছে সিঁড়ির সবগুলো ধাপকে। দুয়েক জায়গায় আবার পাহাড়ের ধূমল মৃত্তিকা প্লাবন ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছে সিঁড়ির জমিন। আর তাই আয়তনের দিক থেকে মেলা জায়গা জুড়ে থাকলেও সিঁড়ির বুকে পা ফেলার স্থান কিন্তু তেমন একটা নেই। সেটুকু অসুবিধা মেনে নিয়েই লম্বা লম্বা ধাপ পেরিয়ে যখন পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছি, তখন দেখি–বেশ কিছু চেয়ার-টেবিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একটি ক্যাফে কেবল সকালের পয়লা কাস্টমার ধরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। উনুনে বসানো হয়েছে জল গরম করার যন্ত্র। জলের বাষ্প পাক খেয়ে ক্যাফের ছাদের যে অংশের দিকে ধেয়ে যায়, সেখানে ছোট্ট একটি টানানো সাইনবোর্ডে লেখা: স্থাপিত, ১৮৬৯।

আমি পাহাড়ের ধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা স্থানে ফাঁকা টেবিল বেছে নিয়ে বসি। অবশ্য, এ বেলায় সবগুলো টেবিলই ফাঁকা। যেকোনো একটিতে বসলেই হতো। কিন্তু বহু নিচের দৃশ্যাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ খুঁজে পাওয়ার লোভে এই টেবিলটির চেয়ে যোগ্য আর কোনো স্থান বোধহয় আর নেই। সেই অর্থে ভাগ্যবান আমি। অন্তত সকালের এই বিশেষ সময়টিতে।

খানিক আগে পাহাড়ের সিঁড়ি বাইবার সময়ে খানিকটা হাঁসফাঁস লাগছিল। মুখে কাপড়ের ঠুলি এঁটে ছিল কিনা। একবার ভেবেছিলাম খুলে ফেলি। কিন্তু পরে দেখলাম, বহু দূরে যে ধীবর একাকী নিভৃতে বসে মাছ ধরছে, তার মুখেও ঠুলি আঁটা। অর্থাৎ, এখানে সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাহলে আমিই বা আইনভঙ্গকারী হব কেন? তবে এখানে যেহেতু মুখে তুলে নিতে হবে পানীয়, তাই অনুমান করি, ক্যাফের এই সীমানায় হয়তো মাস্ক-বিষয়ক আইনটি প্রযোজ্য নয়। আমি তাই মাস্কটি খুলে টেবিলে রাখি। পাশেই পড়ে থাকে জীবাণুনাশকের স্বচ্ছ বোতল। ভেতরে তুঁতরঙা তরল। শুধু এই টেবিলেই নয়, প্রতিটি টেবিলেই একটি করে রাখা। বিশ্বব্যাপী যে অতিমারির তাণ্ডব চলছে, তাতে করে বাড়তি সতর্কতা হিসেবে এমন ব্যবস্থা না করেই বা উপায় কী?

আমাকে দেখে ওয়েটার মেয়েটি এগিয়ে আসে। মেনু কার্ডটি এগিয়ে দেয়ার আগেই আমি ঝটপট এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দেই। তারপর রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে বহু নিচের দৃশ্যাবলী দেখায় মন দেই।

গ্রিসের করফু দ্বীপে এসে পৌঁছেছি গতকাল। অনেক অনিশ্চয়তার পর এই যাত্রা। এর আগের দেড়টি বছর জুড়ে একপ্রকার অন্তরীণ অবস্থা কাটানোর পর মন চাইছিল মুক্তি, চাইছিল জনমানুষের সান্নিধ্য। বহুকাল জেলখানায় কাটানোর পর কয়েদিদের যেমনটা হয়, তেমন। বিষণ্নতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তাই দিন গুনছিলাম, কবে আবার খানিকটা নির্ভার হয়ে পৃথিবীর পথে হাঁটা সম্ভব হবে। পত্রিকায় পাতায় চোখ রাখি। খুঁজে ফিরি সংবাদ। আমেরিকা-নিবাসীদের জন্যে কোনো দেশ তাদের দোর খুলে দিচ্ছে কী? অবশেষে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আচমকাই একটি সংবাদ নজরে এল–যেহেতু আমেরিকায় ভ্যাক্সিনের সফল প্রয়োগের ফলে সংক্রমণ অনেকটাই কমে এসেছে, তাই গ্রিস তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। শর্ত হলো–দুই ডোজ ভ্যাক্সিন নেয়ার প্রমাণ দেখাতে হবে। হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। সেই কবে ফেব্রুয়ারি মাসেই তো ভ্যাক্সিন নিয়ে বসে আছি। প্রমাণপত্রের কার্ডটা অবহেলায় পড়ে আছে পড়ার টেবিলের এক কোণে। ওটা দেখিয়েই যদি গ্রিসের সৈকতে পৌঁছানো যায়, তবে আর বিলম্ব করে কী লাভ!

তবে হ্যাঁ, তারপরও শঙ্কা ছিল। এখনো তো পৃথিবী থেকে অতিমারি দূর হয়ে যায়নি। কবে হবে, তারও কোনো সঠিক দিনক্ষণ নেই। হয়তো আরো দুয়েক বছর এমন অবস্থার মাঝেই পৃথিবীকে চলতে হবে। আর তেমনটা হলে কোনো দেশই স্থির সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারবে না। হয়তো আজ পরিস্থিতি ভালো; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বাদেই যে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেবে না, তার

কী নিশ্চয়তা? এমন বেশ কিছু ঘটনা করোনা সংক্রমণের প্রথম বছরেই ঘটেছে। এমন হয়েছে যে কোনো দেশ পরিস্থিতি নিরাপদ ভেবে নীতিমালা কিছুটা শিথিল করেছে, তার কিছু দিন বাদেই করোনা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানে। তারপর আবারো সেই একই শোকগাথার পুনরাবৃত্তি। তাই মনে মনে নানা হিসাব কষে ভাবলাম, এই বেলাতেই ঘুরে আসা ভালো। অন্তত যত দিন গ্রিসে পরিস্থিতি খানিকটা অনুকূল আছে তত দিন।

শেনজেনভুক্ত যেকোনো দেশে যাওয়ার প্রাক্কালে এই বলয়ের যে দেশটিতে প্রথম যাত্রাবিরতি থাকবে, সেখানেই ইমিগ্রেশনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়। যেমন, আমেরিকা থেকে জার্মানি যাওয়ার কালে যদি আইসল্যান্ডে থেমে আমাকে প্লেন পাল্টাতে হয়, তাহলে আইসল্যান্ডের ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার পাসপোর্টে সিলছাপ্পর মেরে বলবে, ইউরোপে স্বাগত। সেখানেই যদি আমি নেমে পড়ি, তবুও কোনো সমস্যা নেই। সেইভাবেই গ্রিসে যাওয়ার পথে ইমিগ্রেশন পুলিশের মুখোমুখি হলাম অ্যামস্টারডামে। তবে আগেরকার মতো চাইলেই এখানে নেমে পড়া সম্ভব নয়। কারণ গোটা ইউরোপে একমাত্র গ্রিস, সাইপ্রাস আর আইসল্যান্ড ভিন্ন আর কোনো দেশই এখন পর্যন্ত পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানানোর সাহস করে উঠতে পারেনি। এই তিনটি দেশেরও সাহস করে এগিয়ে আসার পেছনে কারণ আছে। এদের সবার জাতীয় অর্থনীতি পর্যটনের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যেমন, গ্রিসের ক্ষেত্রে ওদের জাতীয় আয়ের শতকরা বিশভাগই আসে এই খাত থেকে। কাজেই দীর্ঘকাল পর্যটন বন্ধ করে বসে থাকলে করোনায় না মরলেও দারিদ্র্যের হাতে মরতে হবে।

নেদারল্যান্ড অবশ্য ধনী দেশ। তাদের আরো কিছু দিন হয়তো এভাবে রুদ্ধদ্বার পরিস্থিতিতে কাটানোর মতো সঞ্চয় কোষাগারে আছে। এখানে তাই পুলিশের কড়া নজর–গ্রিসে যাওয়ার নাম করে কেউ আবার হুট করে শিফল এয়ারপোর্টের বহির্গমন দিয়ে বেরিয়ে না যায়!

অ্যামস্টারডাম থেকে এথেন্স। সেখান থেকে আবার ঘণ্টাখানেক পরের প্লেনে করফু দ্বীপে। দীর্ঘ যাত্রাপথ। এতটুকু সময়ে হয়তো আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে পৌঁছে যাওয়া যায়। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের হোটেলটিতে গত রাতে এসে তাই দীর্ঘ ঘুমে এলিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেই ঘুম ভেঙেছে আজ বেশ সকালের দিকে। মোরগের ডাকে।

হোটেলটির মালিক এলেক্স। পৈত্রিকসূত্রে এই হোটেল ব্যবসাটি বুঝে পেয়েছেন। তার বাবা অবশ্য গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। এখন মা আর বউকে নিয়ে এই হোটেল সামলান। এরই একদিকে পরিবার নিয়ে থাকেন।

হোটেলটি ঠিক শহুরে হোটেলের মতো বহুতলবিশিষ্ট নয়। ঢোকার মুখেই দ্বিতল একটি বাড়ি। পেছনের দিকে উঠান। ডান দিকে সাঁতার কাটার পুকুর। আর তার বাদে দুটো একচালা ঘর। ছাদে টালি। সামনে টুকরো বারান্দা। সেখানে কাপড় শুকানোর র‍্যাক। বসার জন্যে একটা ছোট্ট টেবিল। দুটো ধাতব চেয়ার। এই যে পেছনের দিককার দুটি ঘর, এরই একটিতে অ্যালেক্স আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছে।

ঘরটির পাশে এক টুকরো জমিন। সেখানে অ্যালেক্সদের পোষা একদল মোরগ-মুরগি চরে বেড়ায়। আজ সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে এরাই।

অ্যালেক্সের বয়স হয়তো মধ্য চল্লিশ হবে। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌড়বর্ণ। মাথার চুল অনেকটাই উবে গেছে। স্নেহজাতীয় পদার্থের আধিক্য মুখাবয়বে স্পষ্ট। মুখটিতে সর্বদাই লেগে আছে এক টুকরো সুখী-সুখী হাসি। সাত সকালে আমাকে উঠান পেরিয়ে আসতে দেখে নিজের ছোট্ট অফিস থেকে ছুটে এসে বললেন, 'কালিমেরা, কালিমেরা।' অর্থাৎ, শুভ সকাল। এটুকু বলার মাঝেই করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাড়িয়ে দেয়া হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ করে আমার মুষ্টির সাথে ঠোকাঠুকির জন্যে বাড়িয়ে দিলেন। সর্বনাশা করোনা কত কেতাকেই না ধীরে ধীরে বদলে ফেলছে!

হোটেলের প্রাতরাশের ঘরটা একটা হলঘরের মতো। দুদিকেই কাচের দেয়াল। সেগুলো আবার জানালার পাল্লার মতো করে ভাঁজ করে রাখা। ফলে সকালের মিঠে রোদের সাথে সেখানে হুহু করে ঢুকে পড়ে সাগর থেকে ছুটে আসা সমুদ্রবায়ু। সে বায়ুতে স্নান করে টোস্টে মাখন লাগানোর সময়ে কোথা থেকে এক হুলো বেড়াল এসে জুটে যায়। ওটি আমার পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করে। কী জ্বালা! টোস্ট কি আমি খাব? নাকি তোকে দেব? এ নিশ্চয়ই অ্যালেক্সের পোষা বেড়াল। তাই এখানে এসে দুষ্টুমি করার জন্যে জোরে যে একটা ধমক লাগাব, সেটি করতেও সংকোচ হচ্ছে। আমার এই করুণ মুহূর্তে আবারো হাজির হয় অ্যালেক্স। সকালের দিক বলেই হয়তো অফিস ঘরে কাজ নেই। আর তাছাড়া, হোটেলে অতিথির সমাগমও খুব একটা নেই। এই তো গতকালই ওর মুখ থেকে শুনছিলাম–গোটা গত বছরই ব্যবসায় গেছে চূড়ান্ত মন্দা। অথচ করফু দ্বীপে করোনা পরিস্থিতি নাকি ভালোই ছিল। সপ্তাহে হয়তো দুয়েকটা রোগী ধরা পড়েছে। কিন্তু তবুও সতর্কতা হিসেবে সরকার ভিনদেশি পর্যটকদের দ্বীপের কাছে ভিড়তে দেয়নি। সেটিকে খানিকটা বাড়াবাড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করে অ্যালেক্স বলছিল, এভাবে আর কিছু দিন চললে ব্যবসাপাতি

সব লাটে উঠত। বছরখানেক আগেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কয়েকটা গাড়ি কিনলাম ভাড়া দেবো বলে। এর মাঝেই শুরু হলো এসব। যাক গে, সবই নিয়তি। এ বছরটা এখন ভালোয় ভালোয় কাটলেই বাঁচি।

দূরের এক টেবিলে থাকা ওয়াটার স্প্রেয়ার নিয়ে অ্যালেক্স বিড়ালটার পিছু ধাওয়া করে। গায়ে জলের ঝাপটা লাগতেই ওটিও নিমিষেই দৌড়ে পালায়। পলায়নের এই দৃশ্য দেখে অ্যালেক্স বুড়োদের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে। তারপর আমার টেবিলের কাছে এসে বলে, 'তা আজ সকালে কোথায় যাবে ভাবছ?'

সত্যি বলতে কি, আমি কিছুই ভাবিনি। ভাবার মতো অবকাশও খুব একটা ছিল না। কারণ আর সববারের মতো তো আর এবারের ভ্রমণ নয়। এবারে শঙ্কা ছিল, যদি যাওয়ার আগের দিন করে নেয়া করোনার টেস্টে পজিটিভ রিপোর্ট আসে? যদি কোনো কারণে ডাচ বিমানসংস্থা করোনা-সংক্রান্ত নতুন কোনো নিয়মের ছুতো দেখিয়ে বোর্ডিং কার্ড দিতে অস্বীকৃতি জানায়? তবে? সে কারণেই খুব একটা পূর্বপরিকল্পনা করে এবারের যাত্রায় আসা হয়নি।

'ঠিক জানি না। তোমার কোনো সাজেশন আছে?' অরেঞ্জ জুসের গ্লাসটা হাতে নেয়ার সময় বলি।

'উমম, আজ তো রবিবার। রবিবারে এক ক্যাচাল।' এটুকু বলে ও থামে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সোমবারে নানা জাদুঘর, দর্শনীয় স্থান বন্ধ থাকে বলে শুনেছি। তবে কি এখানে রবিবারে সেসব বন্ধ? সে কারণেই অ্যালেক্স ক্যাচালের কথা বলছে?

'আমাদের এটা দ্বীপ। মানুষজন কম। এথেন্সের মতো এখানে মিনিটে মিনিটে বাস পাবে না। হয়তো ঘণ্টায় একটা। আবার রবিবারের দিন সেটা হয়ে যায় কয়েক ঘণ্টায় একটা।'

আমি প্রমাদ গুনি। এ দ্বীপে যে বাস-ট্রামের অবস্থা সুবিধার নয়, সেটা গতকাল এয়ারপোর্টে নেমেই বুঝেছি। চারদিকে শুনশান। কেবল দুই-চারটা লজ-ভিলার লোকেরা তাদের গাড়িতে বোর্ডারদের তুলে নিতে এসেছে। উপায়ান্তর না দেখে আমাকেও অ্যালেক্সকে ফোন করে সাহায্য চাইতে হয়েছিল।

এয়ারপোর্টের প্রসঙ্গ আসায় সে নিয়ে নাহয় দুটো কথা বলি। বিমানের টিকেট কাটার সময় আমি করফু এয়ারপোর্ট নাম লিখে সার্চ করি। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এই নামে কোনো এয়ারপোর্ট নেই। তবে কি এই দ্বীপে বিমানপোতে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই? কিন্তু সেটিও তো হওয়ার কথা নয়। গ্রিসের

প্রখ্যাত দ্বীপ হিসেবে যাদের কথা উঠে আসে, সেই সান্তরিনি, ক্রিট, মাইকনাস, রোডস–তাদের সাথেই একই কাতারে আসে করফুর নাম। এই দ্বীপে বিমানবন্দর থাকবে না, সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। পরে আরো খানিকটা খোঁজ করে বুঝলাম, এখানকার এয়ারপোর্টের নাম: কেরকিরাস এয়ারপোর্ট। কেরকিরাস করফু দ্বীপেরই আরেকটি নাম। স্থানীয় নাম।

এয়ারপোর্টটি বেশ চমৎকার। একদিকে আগ্নেয় শিলায় ঢাকা পাহাড়, অন্য দিকে সাগর। রানওয়ের কোণে কয়েকটি সিঙ্গেল ইঞ্জিনের শৌখিন বিমান পার্ক করে রাখা। আমি নিশ্চিত, এগুলো হয়তো ধনী পর্যটকদের লনিয়ান সাগরে উড়িয়ে নিয়ে নীল জল দর্শনের বন্দোবস্ত করে দেয়। তবে এই করোনাকালীন মন্দার সময়ে প্লেনগুলো অলস হয়ে কিছু দিনের জন্যে ঝিমিয়ে নিচ্ছে হয়তো।

'তুমি বরং এক কাজ করো। আগে ভলাসারনা মঠটা দেখে এসো। এই এখানেই ওটা। হাঁটা পথ। হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানে যাবে। একটু হাঁটলেই দেখবে নিসোস নামের এক রেস্তোরাঁ। ওর পাশ দিয়ে ঢালু পথ। ও পথে গেলেই পেয়ে যাবে মঠটা,' আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে দেখে অ্যালেক্স বলে।

'সে নাহয় গেলাম। তারপর? পুরো দিনটাই কি এভাবে বাউণ্ডুলের মতো আশেপাশে হেঁটে বেড়াব?' অ্যালেক্সের একটা স্বভাব হলো দাঁড়িয়ে কথা বলার সময়ে ও অনবরত এক হাতের মুষ্টি দিয়ে আরেক হাতের মুষ্টিতে ঘুসি মারে। এই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়ার সময় ব্যাপারটা খেয়াল করি।

'ওখান থেকে ফিরে এসে চাইলে আমার ভাড়ার গাড়িটা নিয়ে অ্যাকিলিয়ন প্যালেসে যেতে পারো। যাওয়া আর আসা মিলিয়ে তোমাকে বিশ ইউরো চার্জ করব।'

'দেখা যাক, আগে এই কাছের মঠটা থেকে ঘুরে আসি।' বিশ ইউরো একটু বেশিই মনে হচ্ছে। তাই পরিস্থিতি দেখে পরে সিদ্ধান্ত নেব বলে ঠিক করি।

হোটেলের ঠিক উল্টো দিকেই কিন্তু একটা বাসস্টপের ছাউনি। লোহার একটি বেঞ্চ। পেছনের দিকটাতে অনেকগুলো কচি বাঁশের ঝাড়। ভ্রম হয়, মনে হয় যেন ইক্ষু দণ্ড। হাওয়ায় ক্রমাগত দুলছে সেই দণ্ড। নবীন সবুজ পাতাগুলো আদর বুলিয়ে দিচ্ছে বেঞ্চের হাতলে। ছাউনিতে কেউ নেই। নেই বাসের সময়সূচি লেখা কোনো নোটিশ। তাই পরের বাসটি কি দুই মিনিট পরে এসে দাঁড়াবে নাকি দুই ঘণ্টা পর, সেটি বোঝারও কোনো উপায় নেই।

আমি সেই চেষ্টায় প্রাণপাত না করে নিসোস রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে থাকি। রাস্তাটি ক্রমশ একটি পাহাড়ের দিকে ধেয়ে যায়। অনতিদূরে তীক্ষ্ণ

বাঁক। বাঁকের কোণেই রেস্তোরাঁটি। পথের পাশে বিশাল নোটিশ বোর্ড। সেখানে খাবারের ছবি আর পদের মূল্য। দামের উপর নজর বুলিয়েই বলে দেয়া যায়–এটি মালদার আদমিদের জায়গা। সেটি হওয়ার অবশ্য কারণও আছে। এর তেতলের ছাদ, যেখানে বসার ব্যবস্থা, সেখান থেকে বেশ একটা জম্পেশ ভিউ পাওয়া যায়। সেদিকে তাকিয়ে দেখি, ছাদে পেতে রাখা সবগুলো চেয়ার খালি। হাওয়ায় দুলছে টেবিলে পেতে রাখা সফেদ কাপড়। আমাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে রেলিংয়ের ধারে দৌড়ে আসে ম্যানেজার। 'প্লিজ, আসুন না আমাদের রেস্তোরাঁয়। ভালো অক্টোপাস আছে। ভেজে খাওয়াব।' আমি 'সকালের খাওয়া মাত্র খেলাম, দুপুরে লাঞ্চের সময়ে আপনাদের এখানকার কথা ভেবে দেখব' বলে দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ি।

মঠাভিমুখী ঢালু পথটির দুই ধারে অল্প কয়েকটি বাড়ি। সামনে প্রশস্ত বাগান। সেখানে নানা জাতের ফলদায়ী উদ্ভিদ। বাগান থেকে ভেতর বাড়ি অবধি চলে গেছে বাঁধানো বাগানপথ। এই বাড়িগুলোর সীমানাপাঁচিল টপকে উঁকি মারছে জেসমিন ফুলের ঝাঁক। সবুজ পাতা উপচে সাদা ফুল মৌতাত ছড়াচ্ছে। ফুলের এই উন্মাতাল ঘ্রাণ ডেকে এনেছে রাজ্যের মৌমাছিকে। তাদের মাঝে দুই-চারটা দলছুট হয়ে এসে আমার মাথার চারদিকে বনবন করে ঘুরছে। দুপাশের এই বাড়িগুলো বেশ শুনশান। তেমন একটি বাড়ির বারান্দায় এক বুড়ি বসে আছেন। কুরুশ দিয়ে সোয়েটার বুনছেন। এই ঘোর গ্রীষ্মে তিনি হয়তো শীতের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। আমাকে দেখে খানিকটা মুখ তুলে চেয়ে আবারো উলের সুতো বোনায় মন দেন তিনি। এর দুটি বাড়ি পরের বাড়িটি বেশ অদ্ভুত। হলদে বিবর্ণ বাড়িটিতে খড়খড়ি দেয়া জানালা। দোতলার ঝুল বারান্দাটি এখনো অটুট। নিচতলার মূল দরজাটি হাট করে খোলা। কিন্তু তাই বলে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জো নেই। সাদা অপরাজিতার গাছ বিপুল পত্রালিসহ সেই পথ আগলে আছে। যেন প্রহরী। ওদিকে পুরো বাড়িটাকেই যেন গিলে খাচ্ছে পেঁচিয়ে আসা লতাগুল্ম। জানালার ফাঁকা স্থান দিয়ে ঢুকে পড়েছে অন্দরমহলে। সাগরের এত কাছে এমন এক মোক্ষম স্থানে এই পোড়ো বাড়িটি দেখে মনে খেয়াল জাগে, এটিকে বেশ কম দামে কিনে নিয়ে সংস্কার করে কিছু দিন কাটিয়ে গেলে কেমন হয়?

পায়ে চলা পথটির একেবারে শেষ প্রান্তে উঁচু ঘাসের অরণ্যে প্লাবিত নিচু ভূমি। মাঝের একটি ডুমুর গাছের কাণ্ডে নোটিস আঁটা: 'এই জমি বিক্রয় হবে।' ঘেমে নেয়ে ওঠা এক কৃষক জমির ঘাস কাটার জোগাড়যন্ত্র করছেন। তার যন্ত্রটিতে বুঝি তেল ফুরিয়েছে। জ্যারিকেন থেকে তেল ঢেলে নিয়ে তিনি ঘাস

কাটার যন্ত্রটি বিকট শব্দে চালু করেন। এমন শান্ত স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ সেই শব্দে যেন কাচের আয়নার মতো ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে।

এখান থেকেই সমুদ্র শুরু। আসলে এটি মূল সমুদ্র নয়। বরং সমুদ্র থেকে ছিটকে আসা খাঁড়ি। তাই এখানে উন্মাতাল ঢেউ নেই। ঝিমিয়ে থাকা মন্থর হ্রদের মতোই এখানকার জল আক্রোশবিহীন। খুব মৃদু শব্দে একেকটি ঢেউ তীরের নুড়িগুলোকে ভিজিয়ে দিচ্ছে কেবল। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি মঠটিকে দেখতে পাই। তবে সেটি কিন্তু এপারে নয়। ওপারে।

এপার থেকে ওপারের মাঝে কংক্রিটের ব্যারাজ। একটু দূরে জলের মাঝে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে আছে কংক্রিটের আরেকটি পাটাতন। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন একটি সেতু নির্মাণ করতে গিয়েও কোনো কারণে কাজ শেষ করা হয়নি। শ্রমিকরা সব কাজ ফেলে পালিয়েছে। কেবল রয়ে গেছে নির্মাণ পর্বের প্রাথমিক সাক্ষীখানি। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে এর গায়ে সারি সারি বাতি কেন? আর সেই বাতিগুলো সূর্যমুখী ফুলের মতো কেনই বা আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে? রাতের আকাশ অভিমুখে খামোখা আলোকসম্পাত করেই বা কী লাভ?

লাভ-লোকসানের হিসাবটা বুঝি যখন আমার বাঁ পাশ থেকে চারদিকের পাহাড়গুলোকে প্রকম্পিত করে এক দানবীয় আওয়াজ ভেসে আসে। ওদিকটার পানে চেয়ে আমি একেবারে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই।

টুই এয়ারলাইন্সের বিশাল নীল এয়ারবাস প্লেনটি আমার ঠিক বাম দিকের রানওয়েতে দাঁড়িয়ে। পাগলা ষাঁড় যেমন দৌড়ানোর আগে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে মাটিতে পা দাপায়, ঠিক তেমনি এই বিমানটিও ফাইনাল রান শুরু করার আগে দুপাশের দুই ইঞ্জিন কাজে লাগিয়ে পেছনে ধুলোর ঝড় তুলেছে। ইঞ্জিনের হাওয়ার দমকে সাগরের জলেও তৈরি হয় ক্ষণিকের মাতম। তারপর হুট করেই যেন বিমানটি ছুট লাগায় সম্মুখস্থিত পাহাড়ের পানে। দেখে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বে এর নাক। কিন্তু না, সেই দুর্ঘটনা ঘটার আগেই কৌশলী পাইলট হয়তো থ্রাস্ট বাড়িয়ে বিমানটিকে আরো ঊর্ধ্বমুখী করে পাহাড়ের শীর্ষদেশ প্রায় ছুঁয়ে পালিয়ে যান। তিন দিকে ঘিরে থাকা শৈলশ্রেণি সেই পলায়নদৃশ্যকে দ্রুত আড়াল করে ফেলে।

এবারে আমি বুঝি, ডান ধারে জেগে থাকা সেই একফালি কংক্রিটের স্থাপনার রহস্য। ওগুলো আসলে সার্চ লাইট। রাতের বিমানগুলোকে রানওয়ের নিশানা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। এছাড়া উপায়ও নেই। কারণ এই রানওয়েটি যেন গড়া হয়েছে সাগরের মাঝ থেকে একখণ্ড ভূমিকে জাগিয়ে তুলে। তিন